ইস্যু নং: ০৩
১৫ নভেম্বর ২০০৭
দাম: ৪ টাকা

The Pitribhumi
পিতৃভূমি
ভূমি আগ্রাসন প্রতিরোধ ছাত্র-যুব কমিটির মুখপত্র

Rebellion to a tyrant is obedience to God
-Thomas Jefferson

লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ

লন্ডন প্রতিনিধি:

পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত ভূমি বেদখল ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্ক গত ২৫ অক্টোবর এই বিক্ষোভের আয়োজন করে। বৃটেন প্রবাসী পাহাড়িরা ছাড়াও অনেক মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলে। পরে জুম্ম পিপল্‌স নেটওয়ার্কের নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফকরুদ্দীন আহমেদের বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে বান্দরবান ও দীঘিনালার বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সেটলার কর্তৃক জোরপূর্বক পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমি দখল, আইন বহির্ভূত হত্যাকান্ড ও নির্বিচারে পাহাড়ি রাজনৈতিক ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মিদের গ্রেফতারের বিবরণ তুলে ধরা হয়। এছাড়া স্মারকলিপিতে বেশ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলো হলো মিথ্যা অভিযোগে পাহাড়িদের গ্রেফতার বন্ধ করা, সেটলার ও সেনাবাহিনী কর্তৃক ভূমি বেদখল বন্ধ করা, বেদখলকৃত জমি স্ব স্ব পাহাড়ি মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্র-পৃষ্ঠপোষিত বসতিস্থাপন বন্ধ করা, পাহাড়ি রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করা ও সেনা ক্যাম্প তুলে নেয়া, ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসন করা, পার্বত্য চুক্তি মোতাবেক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা এবং সেটলারদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনরায় পুনর্বাসন করা।

বিক্ষোভে প্রবাসী পাহাড়িরা ছাড়া অন্যান্য সংগঠনের যে সব প্রতিনিধি অংশ নেন তারা হলেন, আনসার আহমেদ (বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ), কমল রাজাপাকসি (সিনহলা ফাউন্ডেশন), ভিলাম ইডিরিউইরা (শ্রীলংকা এসোসিয়েশন অব বৃটেন এন্ড সিনহলা সেন্টার), আইনা হিউম (ভেনিসিং রাইটস), জ্যান জোনস (এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল, বৃটিশ সেকশন) এবং টিসা মাভাওয়েলা (সাংবাদিক)।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, "২০০৭ সালের জানুয়ারী জরুরী অবস্থা জারীর পর থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তায় বেআইনী সেটলারদের কর্তৃক আদিবাসী পাহাড়িদের মালিকানাধীন জমি বেদখলের প্রক্রিয়া জোরদার হওয়ার খবর জেনে আমরা মর্মাহত হয়েছি।"

সম্প্রতি জাতিসংঘে বিশ্ব আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত সনদে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়, এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক যে বর্তমান (বাংলাদেশ) সরকার ১৩ সেপ্টেম্বর পাশ হওয়া আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে বিশ্বের ৩৫০ মিলিয়ন আদিবাসী জনগণের এবং বিশেষত বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। স্মারকলিপিতে জেপিএন নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, "আপনার সরকার এখনো বাংলাদেশের মাটিতে আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলেছে"।

ম্যাজিস্ট্রেট রোকন উদ-দৌলার

শেষ পাতার পর

একর তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড়ি জমি এবং ২২০ নং ময়ূরখীল মৌজায় ৩০ একর তৃতীয় শ্রেণীর পাহাড়ি জমি নামে কিংবা বেনামে ক্রয় করেন। এসব জমি প্রকৃত অর্থে পাহাড়িদের। স্থানীয় সেটেলারদের কাছ থেকে কবুলিয়ত ক্রয়ের মাধ্যমে তিনি ঐ সব জমির দখল নেন। জানা গেছে ঐ কবুলিয়তগুলো জাল করা। তিনি যাদের কাছ থেকে কবুলিয়ত ক্রয় করেন তারা হলেন ময়ূরখীল গুচ্ছগ্রামের ওহাব খন্দকার, মনসুর, শওকত, মোতালেব, গিয়াসউদ্দীন, মশিউর, জামাল, মিজান, বেলাল ও কানাইয়া এবং দেবাতলি গ্রামের থৈরী মারমা ও মুরপাড়া গ্রামের বাবুল সাঁওতাল। অন্য একজনের নাম পাওয়া যায়নি। প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচ একর করে কেনা হয়েছে।

লক্ষীছড়িতে রোকন উদ দৌলার তিনটি গাছের বাগান রয়েছে। দেবাতলিতে থৈরী মারমার কাছ থেকে কৌশলে হাতিয়ে নেয়া ৬ একরের গামারী বাগান, মোবকাবায় আকাশমনি ও বেলজিয়াম হাইব্রিড গাছের বাগান এবং দুর্গাছড়িতে অপর একটি বাগান।

এ সব বাগান ছাড়াও, তিনি যে সব জমি কিনেছেন সেখানে বাগান করেছেন। তার ঐ সব বাগান দেখাশোনা করার জন্য নিয়োগ করেছেন ময়ূরখীল গুচ্ছগ্রামের সেটলার। এদের বিরুদ্ধেও বাগানের আশে পাশে পাহাড়িদের জমি জোরপূর্বক দখলের অভিযোগ রয়েছে।

চ. দুর্গাছড়ি পাড়ার সত্য মাস্টারের ছেলে তাতু মনি চাকমার নামে ৫ একর তৃতীয় শ্রেণীর জমি ছিল। তাতু মনি চাকমা ঐ জমির একাংশ অর্থাৎ তিন একর লক্ষীছড়ি কলেজের নামে দান করেন। বাকি ২ একর জমিকে তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করিয়ে দেন রোকন উদ দৌলা। তার এই সামান্য কাজের জন্য তিনি তাতু মনি চাকমার কাছ থেকে লক্ষীছড়ি বাজারস্থ দুইটি দোকান প্লট জোর করে নিয়ে নেন। পরে তিনি ঐ প্লট দু'টি প্রতিটি ১,২০,০০০ টাকা দরে বিক্রি করে ২,৪০,০০০ টাকা লাভ করেন। প্লটগুলো চাকমা সংসদের পাশে।

ছ. রোকন উদ দৌলার বিরুদ্ধে লক্ষীছড়ি কলেজের নামে ভুয়া প্রকল্প দেখিয়ে সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। অনুসন্ধানে বিস্তারিত বেরিয়ে আসবে বলে লক্ষীছড়িবাসীর ধারণা। এছাড়া তিনি তথাকথিত "নারী কল্যাণ সমিতি" নামে একটি সমবায় সমিতি খাড়া করেন। তার সমিতির সভাপতি বানান তার স্ত্রীকে। এই সংগঠনটির নামেও অনেক ভুয়া প্রকল্প তৈরি করে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অনেকের অভিযোগ। তারা মনে করেন প্রকৃত তদন্ত হলে লক্ষীছড়ি থাকাকালে রোকন উদ দৌলার দুর্নীতির সকল তথ্য বেরিয়ে আসবে।

মাইসছড়িতে ভূমি বেদখল সংক্রান্ত খবর

করল্যাছড়ি ভিতর পাড়ায় বেদখল প্রচেষ্টা

গত ৪ ও ৫ নভেম্বর মাইসছড়িতে সেটলাররা করল্যাছড়ি ভিতর পাড়ায় পাহাড়িদের বন্দোবস্তীকৃত আনুমানিক ১০০ একর জমি বেদখলের চেষ্টা চালায়। তবে ভূমি মালিকদের বাধার কারণে সে চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হয়েছে।

৪ নভেম্বর সকাল ৯টার দিকে দুই গ্রুপ সেটলার দা, কুড়াল নিয়ে ঐ এলাকায় জড়ো হয়। একটি গ্রুপ আসে কিয়াংঘাট থেকে মোবারক (৫০) ও মজিদের (৫০) নেতৃত্বে এবং অন্যটি নুনছড়ি থেকে লেবুর (৪৫) নেতৃত্বে। প্রত্যেক গ্রুপে ছিল ২০ জন করে সেটলার। তারা উক্ত জায়গা দখলের উদ্দেশ্যে জঙ্গল কাটতে থাকে আর তাদের গরু ছাগলের জন্য কাটে ঘাস। জমির মালিকদের পক্ষে গ্রাম প্রধান নিখিল কার্বারী বাধা দিলে সেটলাররা তার কথায় কোন কর্ণপাত করেনি। উল্টো সেটলার মোবারক তাকে হুমকি দিয়ে বলে যে, "আমরা আবার আগামী কাল আসবো, যদি পার বাধা দিও"।

কথামত সেটলাররা পরদিন অর্থাৎ ৫ নভেম্বর আবার জঙ্গল কাটতে আসে। এবার অবশ্য মাত্র ২৩ জনের একটি দল, নুনছড়ির মজিদের নেতৃত্বে। তারা জঙ্গল কাটতে থাকলে, পাহাড়িরা আবার বাধা দেয় এবং জিজ্ঞেস করে কে তাদেরকে এভাবে অন্যের জমি বেদখল করতে বলেছে। এর উত্তরে মজিদ জানায় যে, "আমরা এখন যেখানে আছি সেখানে আর সরকার থাকতে দিচ্ছে না, তাই এখানে বাড়ি করার জন্য জঙ্গল কাটতে এসেছি"। দ্বিতীয় বার বাধা দেয়ার পর সেটলাররা ঐ এলাকায় আর জঙ্গল কাটতে যায়নি।

করল্যাছড়ি ভিতর পাড়া গ্রামের উক্ত জমি পাহাড়িদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বন্দোবস্তীকৃত বলে জানা গেছে। এর মধ্যে উল্টোছড়ি প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক আনন্দ চাকমার (৫০) রয়েছে সেগুন বাগানসহ ৪ একর, পয়াসুর চাকমার ছেলে বীর লাল চাকমার (৪৭) রয়েছে ১০ একর এবং নিখিল কার্বারীর ১ একর। এছাড়া আরো বেশ কয়েকজনের জমি রয়েছে।

রত্নসেন কার্বারী পাড়ায় জমি বেদখল

মহালছড়ি থানার মাইসছড়ি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডে রত্নসেন কার্বারী পাড়ায় ২৫-৩০ পরিবার এবং রবিচন্দ্র পাড়ায় ৩০ পরিবার সেটলার জোরপূর্বক বসতিস্থাপন করেছে।

রবিচন্দ্র পাড়ার নাণ্টু বাপের ৪ কানি, মতিলাল চাকমার ৫ কানি, কাচাভলো চাকমার ৫ কানি এবং সুধীর চাকমার প্রায় ১০ কানি (৪ একর) জায়গা বাঙালি সেটলাররা বেদখল করেছে এবং প্রায় ২৫ - ৩০ পরিবার সেটলার বসতিস্থাপন করেছে। তারা কাচাভলো চাকমার গামারী এবং কাঁঠাল গাছ কেটে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করে। আর সুধীর চাকমার বাগানের গাছ ও বাঁশ কেটে সে জায়গায় ১০ পরিবার সেটলার বসতিস্থাপন করে।

অপরদিকে রত্নসেন পাড়ার মন্তুর কান্তি চাকমার ৪ কানি জমি ৪/৫ পরিবার সেটলার বাঙালি জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে বসতিস্থাপন করেছে এবং ঐ জমিতে সৃজিত সেগুন বাগানটি তাদের বলে দাবি করছে। এছাড়া, জ্যোৎস্না কান্তি ও সুকৃতি চাকমার ৪ একর জায়গা ৭/৮ পরিবার সেটলার, বিজিয়ো চাকমার ৪ কানি জায়গায় ৪/৫ পরিবার, জ্ঞান চাকমার ২ একর জমি (গাছ ও কলাবাগানসহ) ৭/৮ পরিবার, রাজে চাকমার ৪ কানি জমি (কলা ও গাছ বাগানসহ) ৪ পরিবার এবং সন্তোষ মনি চাকমার ৪ কানি বাঁশ বাগান ২ পরিবার সেটলার অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। এখন নিজের বাগানে পাহাড়িরা গাছ বাঁশ কাটতে গেলে সেটলাররা ধাওয়া করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। পাহাড়িরা বাপ দাদার আমল থেকে ঐ সব জমি ভোগ দখল করে আসছে। সেনাবাহিনীর সহায়তায় সেটলাররা সম্প্রতি এ জমি জোরপূর্বক দখল করে নিয়েছে।

"কালিবন্ধু ত্রিপুরাকে ক্রসফায়ারে দেয়া হবে"

নুনছড়ি খলিপাড়ার বাসিন্দা কালিবন্ধু ত্রিপুরার (পীং তাজেরায় ত্রিপুরা) একমাত্র সম্বল একটুখানি ধান্য জমি। তার সে জমিতে হজরত আলী নামে এক বাঙালি জোর করে কলা গাছ রোপন করেছে। বাধা দিলে উক্ত হজরত আলি সেনা ক্যাম্পে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করে। পরে সেনা সদস্যরা গ্রামে গিয়ে কালিবন্ধুকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে খোঁজ করে। তিনি কোন রকম পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তাকে না পেয়ে সেনারা এলাকার লোকদের ডেকে বলে যায় যে, কালিবন্ধুকে পেলে ক্রসফায়ারে দেয়া হবে।

মানিক্যা ত্রিপুরার উঠোন বেদখল

নুনছড়ি হেডম্যান পাড়ার বাসিন্দা মানিক্যা ত্রিপুরা পীং অখিয়ার ত্রিপুরা দিন মজুরী করে কোন রকমে সংসার চালান। হাশেম আলীর নেতৃত্বে ১০ - ১২ জন বাঙালি জোরপূর্বক তার বাড়ির উঠানে ঘর তৈরি করে। এ সময় বাধা দিলে হাশেম আলী নিজেকে ভিডিপির কমান্ডার হিসেবে পরিচয় দেয় এবং বাড়াবাড়ি করলে পরিণাম খারাপ হবে বলে হুমকি দেয়। এক পর্যায়ে ঐ সেটলার ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তার নিজের ঘরের জিনিসপত্র বাইরে এনে খড় দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়ার পর অভিনয় করে কাঁদতে কাঁদতে বিজিতলা আর্মি ক্যাম্পে যায় এবং মিথ্যাভাবে অভিযোগ করে যে তার বাড়ির জিনিসপত্র গ্রামের লোকজন পুড়িয়ে দিয়েছে। এরপর ক্যাম্প থেকে গ্রামের পাহাড়িদের ডাকা হয় এবং হুমকি দিয়ে বলা হয় যে বেশী বাড়াবাড়ি করলে অস্ত্র মামলায় ফাঁসানো হবে। এলাকার লোকজন চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করছেন।

আপনার এলাকায় জমি বেদখলের ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন এবং আমাদের জানান।

সম্পাদকীয় নোট

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে অহরহ ভূমি বেদখলের খবর পাওয়া যাচ্ছে। জরুরী অবস্থায় সভা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে কেউ তার প্রতিবাদ করতে পারছে না। এমনকি পাহাড়ি ভূমি মালিকরা বেদখলকারীদের বিরুদ্ধে মামলা কিংবা অভিযোগ দায়ের করতেও সাহস পাচ্ছেন না। এমতাবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি অনুরোধ অবিলম্বে ভূমি আগ্রাসন বন্ধ করতে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হোক এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে পাহাড়ি জাতিসত্তাগুলোর প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন করা হোক।

পানছড়িতে জমি বেদখল প্রচেষ্টা অব্যাহত

শান্তি প্রিয় চাকমা (৪৫) পীং অক্ষয় চাকমা (মেম্বার) গ্রাম অক্ষয় মেম্বার পাড়া, ২৪২ নং পূজগাঙ মৌজা, ৩ নং পানছড়ি ইউনিয়ন, থানা পানছড়ি, জেলা খাগড়াছড়ি। তার নামে ১৯৫৭ সালে রেজিষ্ট্রিভুক্ত ৭ একর ৬২ ডেসিমেইল তৃতীয় শ্রেণীর জমি রয়েছে। গত ৪ অক্টোবর ২০০৭ বাগান করার জন্য তার উক্ত জমি একই গ্রামের পাঁচ জনকে দেন। এই পাঁচ জনের চার জন হলেন দেব প্রিয় চাকমা (৩৫) পীং সশাসা চাকমা, বিজন মনি চাকমা (৩৫) পীং মৃত বুলু চাকমা, কালা মনি চাকমা (৩২) পীং গরাজ চাকমা, চান্ডা চাকমা (৩৭) পীং মৃত নন্দাহাজি চাকমা। বাকি এক জনের নাম জানা যায়নি।

উক্ত পাঁচ ব্যক্তি গত ৫ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে ঐ জমিতে বাগান করার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করতে গেলে মনির (৫০) নামে এক সেটেলার জঙ্গল কাটতে নিষেধ করে এবং ঐ জায়গা তার নিজের বলে দাবি করে। পাহাড়িরা জমির মালিকানা প্রমাণের জন্য তার পরদিন কাগজপত্র নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য মনিরকে বলে এবং তারাও কাগজপত্র নিয়ে আসবে বলে জানায়। কিন্তু পরদিন উক্ত মনির কাগজপত্রের বদলে শ' দেড়েক সেটেলার নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। পাহাড়িরা সেটেলারদের মারমুখী অবস্থান লক্ষ্য করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে এবং বিষয়টি জমির মালিক শান্তিপ্রিয় চাকমাকে জানায়। সেটেলাররা এরপর সেই জায়গার কয়েকটি কাঁঠাল গাছ কেটে ফেলে রেখে যায়।

অপরদিকে, মনির পানছড়ি গিয়ে মিথ্যাভাবে অভিযোগ করে যে পাহাড়িরা তার জায়গা দখল করে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাকে মারধর করেছে। এরপর জোন কমান্ডার উক্ত পাঁচ পাহাড়ি ও জমির মালিক শান্তি প্রিয় চাকমাকে ক্যাম্পে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করে। ক্যাম্পে গেলে জোন কমান্ডার শান্তিপ্রিয় চাকমাকে বলে, "তোমরা জায়গাটার ব্যাপারে টিএনও-র কাছে দরখাস্ত করে এবং মেপে ভাগ করে নাও। তবে এই জায়গাটার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন বাঙালি ও পাহাড়ি সেখানে যেতে পারবে না।"

সেটেলারদের মনগড়া দাবি ও তাদের প্রতি সেনাদের উলঙ্গ পক্ষপাতিত্বের কারণে শান্তি প্রিয় চাকমার মতো বহু পাহাড়ি তাদের জমির ভোগ দখল করতে পারছে না।

সাধনা টিলার জমি দখলের ষড়যন্ত্র অব্যাহত

বলপূর্বক সাধনা টিলার ৩০০ একর জমি দখল নিতে ব্যর্থ হওয়ার পর উগ্রবাদী ভূমি আগ্রাসীরা এখন দলিলপত্র নকলবাজি ও ষড়যন্ত্র করে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সাধনা টিলার ঐ জমি সেটেলারদের প্রমাণ করতে তারা ভাড়াটে সাংবাদিক দিয়ে পত্রিকায় বিকৃত ও উল্টাপাল্টা তথ্য দিয়ে রিপোর্ট ছাপাচ্ছে। কিন্তু আশির দশকে সেটেলারদেরকে বসিয়ে দেয়ার আগে সেখানে কারা বসবাস করতেন, কিংবা কাদেরকে জোরপূর্বক উঠিয়ে দিয়ে সেখানে সেটেলারদের বসিয়ে দেয়া হয় সে ব্যাপারে পত্রিকার রিপোর্টগুলো একেবারে নীরব।

সম্প্রতি আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে লাঠিয়াল বাহিনী দিয়ে চর দখলের মতো উগ্রবাদীরা সাধনা টিলার জমি জবরদখলের চেষ্টার পাশাপাশি সেটেলারদেরকে জমি বন্দোবস্তীর কাগজপত্র তৈরি করে দেয়ার জন্য দীঘিনালা উপজেলা প্রশাসনের ওপর অব্যাহতভাবে চাপ দিতে থাকে। ফলে তাদের চাপে পড়ে দিন রাত পরিশ্রম করে অবশেষে প্রশাসন নকল দলিল তৈরি শেষ করে। অপরাধী গোপনে অপরাধ করলেও তারই নিজের অজান্তে সে অপরাধের আলামত রেখে যায়। জমির দলিল জালিয়াতি করতে গিয়ে প্রশাসনের সে রকম অবস্থা হয়েছে। এ সব দলিলে সেটেলারদের বন্দোবস্তী দেখানো হয়েছে '৮৪ - '৮৫ সালে, কিন্তু জমাবন্দীতে ভূমি কর্মকর্তা ও আমিন কানুনগোর স্বাক্ষর দেয়া আছে ২০০৪ সালের ২১ অক্টোবর। অপরদিকে এসব "বন্দোবস্তীকৃত" জমির বিপরীতে সরকারী ট্রেজারীর মাধ্যমে খাজনা দেয়া হয় '৮৪ সালেরও বহু আগে থেকে। অথচ স্থানীয় হেডম্যান এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, সেটেলারদের নামে যদি সাধনা টিলার জমি বন্দোবস্তী দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তা হেডম্যানের সম্মতি ছাড়া দেয়া হয়েছে এবং সে কারণে ঐ বন্দোবস্তী অবৈধ। কারণ আইন মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামে হেডম্যানের অনুমতি ছাড়া জমি বন্দোবস্তী দেয়া যায় না।

অপরদিকে, জনৈক রেজাউল করিম (পিতা তোফাজ্জল হোসেন, মধ্য বোয়ালখালী আশ্রম, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি) সাধনা টিলা বনবিহার কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্নেহময় চাকমার বিরুদ্ধে "উচ্ছেদ আদেশসহ দখল পুনরুদ্ধারের" মামলা দায়ের করেছে। জেলা প্রশাসক (পদাধিকার বলে জেলা জজ) আবেদনকারীর আর্জি গ্রহণ করে,স্নেহময় চাকমাকে আগামী ২৩ জানুয়ারী ২০০৮ লিখিত জবাব দেয়ার নির্দেশ জারী করেছেন এবং একই সাথে উক্ত সাধনা টিলার জমি বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে স্থিতাবস্থার আদেশ দিয়েছেন।

গত ২৪ অক্টোবর টিএনও ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য এক মিটিংয়ের আহ্বান করেন। এতে বাবুছড়া চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা, হেডম্যান সত্যেপ্রিয় চাকমা, বন বিহারের স্নেহময় চাকমাসহ বাবুছড়া ইউপির ছয়জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সেটেলারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বোয়ালখালি ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ, মেরুং ইউপি চেয়ারম্যান মোসলেম উদ্দীনসহ ২০/৩০ জন। টিএনও ম্যাপশিট বের করে দেখাতে থাকেন কোন জায়গা বনবিহারের এবং কোন জমি বন বিহারের বাইরে। বন বিহারের এলাকার বাইরে যে সব জায়গা রয়েছে তা সেটেলারদের কবুলিয়ত অনুসারে মেপে পরিচিহ্নিত করা হবে বলে তিনি জানান। সভায় উপস্থিত বাবুছড়ার চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ এক যোগে তার প্রতিবাদ করে বলেন সাধনা টিলায় কোন জমি খালি নেই। এছাড়া তারা আরো অনেক যুক্তি তুলে ধরেন, কিন্তু টিএনও তা আমলে না নিয়ে সেটেলারদের তুষ্ট করতে আগামী নভেম্বরের প্রথম দিকে জায়গা পরিচিহ্নিতকরণ কাজ চলবে বলে মনগড়া সিদ্ধান্ত দেয়। তার এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক এবং যে কোন উপায়ে সাধনা টিলার জমি বেদখল করতে একটি মহল যে কতটুকু বেপরোয়া হয়ে উঠেছে তা তার ঐ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।

সাধনা টিলার জমি কার? সাধনা টিলার জমি নিঃসন্দেহে পাহাড়িদের। বংশ পরম্পরায় এ জমি তারা ভোগ দখল করে আসছে। ১৯৮৩ সালের শেষার্ধে সেটেলারদের জোরপূর্বক বসিয়ে দেয়ার আগে সেখানে নন্দী চরণ, রাষ্ট্রী চরণ, নিপুল (বাশরী বাপ), অরুণ দেবী বাপ ও গুইপেদা সহ ১৫ - ২০টি পাহাড়ি পরিবার বসবাস ও জুম চাষ করতেন। ব্যাপক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে সাধনা টিলার বহু সেটলার একেবারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যান এবং বাকিদেরকে সেনাবাহিনী ১৯৮৬ তুলে নিয়ে মেরুং এলাকায় বসিয়ে দেয় বহু পাহাড়ি পরিবার উচ্ছেদ করে। ১৯৮৬ থেকে ২০০৭ - এই দীর্ঘ ২২ বছর পর হঠাৎ উগ্রবাদীদের মাথায় সাধনা টিলার জমিতে নতুন করে সেটলার বসিয়ে দেয়ার খেয়াল চেপে বসে। শুরু হয় ষড়যন্ত্র ও জমি বেদখলের জন্য বেপরোয়া ও উলঙ্গ শক্তি প্রদর্শন। সাধনা টিলার উক্ত জমি যদি সেটেলারদের হতো তাহলে তারা দীর্ঘ বাইশ বছরে দখল নেয়ার জন্য সচেষ্ট হতো, আইনের আশ্রয় নিতো এবং যখন ভারতের শরণার্থী শিবির থেকে ফিরে এসে উচ্ছেদ হওয়া পাহাড়িরা সেখানে ঘরবাড়ি ও বিহার তুলছিল তখন তারা প্রতিবাদ করতেন। কিন্তু যেহেতু সেটেলাররা জানেন যে ঐ জমি তাদের নয়, সেজন্য তারা নীরব ছিলেন। সুতরাং সাধনা টিলার জমি দখলের জন্য উগ্রবাদীরা যা করছেন তা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

এছাড়া আরো কথা আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এ অঞ্চলটি এক সময় রাজা শাসিত পৃথক রাজ্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এখানে ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন ছিল যা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। কিন্তু ঐতিহ্যগত পাহাড়ি জনগণের নিজস্ব আইন পায়ের জোরে পদদলিত করে প্রথমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং পরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠি। তারা তাদের ইচ্ছা বা আইন পাহাড়ি জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। যে আইনের বলে পাহাড়িরা শত শত বছর ধরে জমির ভোগ দখল করে আসছিলেন তাদের সে আইন পায়ের জোরে রদ অথবা সীমিত করে দেয়া হয়। পাহাড়িদের মালিকানাধীন হাজার হাজার একর জমি "খাস" অভিহিত করে কেড়ে নেয়া হয়। সভ্যতার নামে তা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়। সরকারের উচিত বৃটিশদের উপনিবেশিক বোঝা ঝেড়ে ফেলা ও পাহাড়িদের নিজস্ব ভূমি আইনকে স্বীকৃতি দেয়া। ■

ইস্যু নং: ০৩ ■ ১৫ নভেম্বর ২০০৭

টিএনও-র নির্দেশ:
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা যাবে না

মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আবদুল মতিন এক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তার এলাকায় মন্দির মসজিদসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। ১২ সেপ্টেম্বর জারীকৃত উক্ত বিজ্ঞপ্তির স্মারক নম্বর হলো ১১৪৭। এতে উল্লেখ করা হয়: "এই মর্মে মহালছড়ি উপজেলার সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া কোন এলাকায় নতুন কোন মন্দির, মসজিদ, কেয়াং নির্মাণ করা যাবে না। বিনা অনুমতিতে কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।"

কি কারণে উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়নি। তা ছাড়া, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ করে তার এই নিষেধাজ্ঞা জারী করাটা কতটুকু আইনসম্মত হয়েছে তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। আর কেনই বা শুধুমাত্র মহালছড়ি উপজেলায় এই নোটিশ দেয়া হয়েছে? বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১ ধারায় সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে: (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহন কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।"

কাজেই মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উক্ত বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারি সুস্পষ্টভাবে সংবিধানের লঙ্ঘন। এতে বিনা কারণে নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে জরুরী বিধিমালা জারী করেছে তাতেও ধর্মীয় অধিকারের ওপর কোন রূপ হস্তক্ষেপ করা হয়নি।

আপাতত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, সব ধর্মের ওপরই উক্ত নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে এবং কোন একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত করা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ ক্ষেত্রে অবস্থা হবে ভিন্ন। এখানে যে কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনুমতি দেবে সে কে? কি তার পরিচয় (ধর্মীয় পরিচয়সহ)? অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে তার রয়েছে একক ক্ষমতা ও স্বাধীনতা। ঐ কর্তৃপক্ষ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করতে পারে। কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠিকে অনুমতি দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যায্য অনীহা দেখাতে পারে। সব ধর্মের নাম উল্লেখ করা হলেও, এখানেই হলো ঐ নোটিশের শুভঙ্করের ফাঁকি। কোন একটি বিশেষ ধর্মকে লক্ষ্য রেখে উক্ত বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আমরা মনে করি মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উচিত হবে অবিলম্বে ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণকারী উক্ত নোটিশ প্রত্যাহার করে নেয়া।

ম্যাজিস্ট্রেট রোকন উদ-দৌলার আরেক রূপ

ম্যাজিস্ট্রেট রোকন উদ-দৌলা

সারা দেশে তিনি ভেজাল বিরোধী অভিযানের নায়ক হিসেবে পরিচিত। টিভি ও সংবাদপত্রে তার অভিযানের কাহিনী ফলাও করে প্রচার করা হয়। ভেজাল ব্যবসায়ী, দোকানদার ও ফ্যাক্টরীর মালিকরা তার ভয়ে থাকেন তটস্থ। তার নাম রোকন উদ-দৌলা। ঢাকায় কর্মরত একজন ম্যাজিস্ট্রেট। তার ভেজাল বিরোধী অভিযান নিঃসন্দেহে প্রসংশার যোগ্য হলেও তার এই পরিচিতির আড়ালে রয়েছে অন্য এক রূপ, যা অনেকের কাছে অজানা।

ম্যাজিস্ট্রেট রোকন উদ-দৌলা ২০০৩ - ০৪ সালে খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি থানায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তার বিরুদ্ধে বহু পাহাড়ির জমি নানা কৌশলে দখল করে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। সারা দেশে তিনি ভেজাল বিরোধী অভিযানের নায়ক হিসেবে পরিচিত হলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের এক কোণায় লক্ষীছড়ি জনগণের কাছে তিনি ভূমি দস্যু হিসেবেই পরিচিত, নিন্দিত ও সমালোচিত। তিনি দায়িত্বশীল সরকারী কর্মকর্তা হয়েও এত নীচুতে নামতে পারেন যে, তিনি এমনকি চরম পশ্চাদপদ ও নিরীহ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শ্মশানের জায়গা পর্যন্ত বেদখল করে নিয়েছেন। তিনি একদিকে পাহাড়ি ও বাঙালীদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ উস্কে দেন এবং অন্যদিকে সেই দ্বন্দ্বকে ব্যবহার করে নিজে জমি দখল করে নেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তিনি লক্ষীছড়ি থানার নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত থাকার সময় ২১৮ নং ঝুর্গাছড়ি মৌজা ও ২২০ নং ময়ূরখীল মৌজার পাহাড়িদের মালিকানাধীন শত শত একর জমি তার পদবীর প্রভাব খাটিয়ে বেদখল করে নেন। নীচে তার এই অপকর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল:

ক. রোকন সাহেব লক্ষীছড়িতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় কূটকৌশল খাটিয়ে পাহাড়ি ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের তৃতীয় শ্রেণীর জমি এবং সাঁওতালদের শ্মশানের জায়গা জবরদখল করে নেন। সাঁওতালরা তাদের শ্মশানের জায়গা পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা করে বহু টাকা পয়সা খরচ করেন। কিন্তু উক্ত জায়গা উদ্ধার করতে পারেননি। উপরন্তু দুই সাঁওতালের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেয়া হয়েছে। তারা এখন পলাতক রয়েছেন।

খ. তিনি পাহাড়ি ও সেটলারদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ লাগিয়ে দিয়ে কৌশলে ঐ জমি নিজে হস্তগত করেন। যেমন, ২২০ নং ময়ূরখীল মৌজাধীন দেবাতলি পাড়ার থৈরী মারমা নামে এক পাহাড়ির ৬ একরের মতো গামারী গাছের বাগান ছিল। তিনি ঐ বাগান করতে বহু পরিশ্রম করেন এবং গাছগুলো বেশ বড় হয়েছে। একদিন জনৈক সেটলার ঐ জমির মালিকানা দলিল নকল করে বাগানের গাছগুলো কাটতে আসে। থৈরী মারমা বাধা দিলে উক্ত সেটলার নিজেকে ঐ জমির মালিক দাবি করে এবং তার সমর্থনে কবুলিয়ত দেখায়। বাধার মুখে সেটলাররা চলে যায় এবং লক্ষীছড়ি থানায় থৈরী মারমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। এরপর রোকন উদ দৌলা কয়েকজন সরকারী কর্মকর্তা ও স্থানীয় মুরুব্বী নিয়ে ঐ অভিযোগ তদন্ত করতে থৈরী মারমার বাগানে যান এবং বাগানটি ঘুরে ঘুরে দেখেন। তার কয়েকদিন পর রোকন উদ দৌলা থৈরী মারমাকে তার বাসায় ডেকে বলেন: "জায়গাটা তোমার নয়। বিচারে জায়গাটা তুমি পাবে না। কারণ সেটলারের নামে কবুলিয়ত আছে। বরং তুমি ঝামেলায় না গিয়ে জায়গাটা বাগানসহ আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে এক লক্ষ টাকা দেবো।" নিরুপায় হয়ে থৈরী মারমা ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের বাগান পানির দরে রোকন উদ দৌলার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হন।

গ. রোকন উদ দৌলার প্রত্যক্ষ ইন্ধনে ময়ূরখীল গুচ্ছগ্রাম ও মগাছড়ি গুচ্ছগ্রামের সেটলাররা মোবকাবা, কালাপানি, মগাছড়ি, রন্যামাহড়া, ঝুর্গাছড়ি, মথুয়া পাড়া ও মেজাপাড়ায় পাহাড়িদের দখলীয় ও বন্দোবস্তীকৃত জমি ও পাহাড় বেদখল করে নেয়। সেটলাররা ঐ জমিতে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে। এছাড়াও তিনি পাহাড়ি ও সেটলারদের বিরোধপূর্ণ জমিতে সেটলারদেরকে ঘরবাড়ি তুলতে উৎসাহ দেন।

ঘ. তিনি যে সমস্ত এলাকায় জমি বা বাগান কিনেছেন সে সমস্ত জায়গায় যাতায়াতের সুবিধার্থে রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন সরকারী টাকায়। এ জন্য তিনি সরকারী প্রকল্প তৈরি করেন।

ঙ. রোকন উদ দৌলা ২১৮ নং ঝুর্গাছড়ি মৌজায় ৪৫ ২য় পাতায় দেখুন